আদর্শ জননী

কামরুল আম্বিয়া
হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)

ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

বাংলায় প্রথম সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৭৮
(বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত)

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আগষ্ট, ১৯৯৬
৩,০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েট্স

দু'টি কথা

সন্তানের তালীম তরবীয়তের ব্যাপারে মায়ের দায়িত্ব যে অপরিসীম তা সকলেই স্বীকার করেছেন। এ বিষয়টিকে আরও জোর দিয়ে বলার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন -মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্ত। কথাটা পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে, মা বেহেশ্তী হলেই তো তার পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্ত হতে পারে। সুতরাং মাকে যে একজন আদর্শ মা হতে হবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একজন মা কীভাবে আদর্শবতী হবেন সে বিষয়াবলী কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) তার **'আচ্ছি মায়েঁ'** পুস্তিকায় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

'আদর্শ জননী' নামে এ পুস্তিকাখানার বঙ্গানুবাদ করেছেন মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। ১৯৭৮ সনে প্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ পুস্তিকাখানা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। এবারের সংস্করণে অনুবাদক ভাষাকে আরও সাবলিল করেছেন এবং মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাছাড়া পর্দা প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবার অংশবিশেষ পরিশিষ্টাকারে সংযোজন করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষাভাষী মায়েরা এ পুস্তক থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি।

এ পুস্তিকা প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

৩১শে আগষ্ট,
১৯৯৬ইং

মকবুল আহমদ খান
ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আদর্শ জননী

(সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের দশটি সোনালী সূক্ষ্ম কথা)

প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, ইসলাম নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে সাম্যের নির্দ্দেশ দিয়েছে এবং কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, "লাহুন্না মেসলুল্লাযী আলায়হিন্না" (সূরা বাকারা ঃ ২২৯ আয়াত-অনুবাদক) অর্থাৎ নারীর উপর পুরুষের যতটুকু অধিকার, পুরুষের উপরও নারীর ততটুকু অধিকার। কিন্তু অধিকারের প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে বা নীতিগতভাবে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত,–সন্তান–সন্ততির প্রাথমিক তরবীয়তের ব্যাপারে নারী তার নিজস্ব স্বাভাবিক বৃত্তির শক্তিতে এবং শারিরীক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। নিঃসন্দেহে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষের দায়িত্বাবলী অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শৈশবে, সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের দিকটা এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাব এত ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক যে, যদি নারী এই দায়িত্বাবলী সফলতার সাথে পালন করতে পারে তা'হলে ইহা নিশ্চিত যে, জাতি এবং সমাজের মধ্যে তার অবস্থান অতি সম্মানের এবং গর্বের হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সম্মানিত মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য তার মা এবং বোনের পদ প্রান্তে উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত।

নারী জাতির প্রিয় মর্যাদা

নারীর এই বিশেষ মর্যাদা এবং বিশেষ দায়িত্ব কেন ? আমাদের প্রভু (সাঃ) বলেছেন, "হুব্বিয়া ইলাইয়া মিন্ দুনিয়াকুম আন্নিসা'উ ওয়াত্তীবু ওয়া জুয়িলাত কুর্‌রাতু আয়্‌নী ফিস্‌সালাত।"

অর্থাৎ "হে লোকসকল, তোমাদের দুনিয়ার সামগ্রী থেকে আমার দু'টি বস্তু অধিক প্রিয়। প্রথমটি নারী এবং দ্বিতীয়টি হ'ল সুগন্ধি, কিন্তু নামায আমার চক্ষুকে ঠাণ্ডা করে"।

আমাদের প্রভুর এই সোহাগ ভরা কথায় নারী যতই গর্ব করুক, এটা তার প্রাপ্য এবং আমরা এই গর্বে সহানুভূতিশীল। একথা সুস্পষ্ট যে, খোদাতা'লার প্রত্যেক আশিস কতগুলি বিশেষ বিশেষ দায়িত্বও বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু যে নারী আশিসের অংশ যত্নের সাথে গ্রহণ করে, কিন্তু উহার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, সে কখনই খোদার দরবারে গৃহীত হ'তে পারে না এবং কেবল আশিস গ্রহণ করে, দেশ এবং জাতির গৌরব হ'তে পারে না। অতএব আমি এই সামান্য লেখার মাধ্যমে ভগ্নীগণকে তাঁদের দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে চাই যা সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা তাদের স্কন্ধে অর্পিত, যাতে তারা আদর্শ জননী হয়ে একদিকে খোদার আশিস লাভ করতে পারে এবং অন্য দিকে জাতির এবং জমাতের ভবিষ্যত বংশধরদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে দেশ এবং জাতির গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

মুসলমান পুরুষের সর্বদা ধর্মপরায়ণা নারীর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত

এই প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই আঁ হযরত (সাঃ)-এর ঐ বরকতমণ্ডিত বাক্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় যা তিনি রাফিকা হায়াতের নির্বাচন উপলক্ষ্যে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ "তুনকাহুল মারআতু লি আরবাইন লেমালেহা ওয়ালেহাসাবিহা ওয়ালে জামালেহা ওয়ালে দীনিহা ফায্ফার বে যাতিদ্দীনি তারিবাত ইয়াদাকা"-অর্থাৎ, স্ত্রী নির্বাচনের জন্যে চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়-কতক লোক ধন-সম্পদের উপর ভিত্তি করে স্ত্রী নির্বাচন করে, কতক লোক বংশ মর্যাদার উপরে নিজেদের স্ত্রী নির্বাচনের ভিত্তি রাখে, কতক নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং কতক লোক ধর্ম এবং চরিত্রকে প্রাধান্য দান করে। কিন্তু হে মুমেন সম্প্রদায় ! তোমরা সর্বদা চরিত্র এবং ধর্মের দিককে প্রাধান্য দান কর, নচেৎ তোমাদের হাত ধূলিমণ্ডিত থাকবে" (অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থ হবে-হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণনায় বুখারী-অনুবাদক)।

এই পবিত্র হাদীসে আমাদের প্রভু (সাঃ) কেবল মুসলমান গৃহিণীদেরকে আপাততঃ পারিবারিক শান্তির ভিত্তি বলেই ক্ষান্ত হননি বরং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মঙ্গল ও অমঙ্গলের প্রশ্নকেও এমন একটি শক্ত এবং স্থায়ী হাতলের সাথে বেঁধে দিয়েছেন যা তারা ভাঙ্গতেই জানে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, একজন উত্তম এবং পুণ্যবতী স্ত্রী, দুনিয়াদার এবং উত্তম চরিত্রের হতে পারে (কেননা, দীন শব্দের মধ্যে দুনিয়াও অন্তর্ভুক্ত)। সে কেবল নিজের স্বামীর সঙ্গী এবং সুখের কারণই হবে না বরং অবশ্যই নিজের সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের দায়িত্ব পালনার্থে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং এভাবেই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আনন্দ ও খুশীর সমন্বয় সাধন করে প্রকৃত অর্থে বেহেশ্‌তের নমুনায় একটি সংসার গঠন করবে।

এ রকম চিন্তা করা ঠিক নয় যে, হাদীসে কেবল মাত্র পুরুষগণকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করে এবং নারীদের জন্যে এরকম কোন আদেশ নেই যে,তারা যেন ধর্মপরায়ণা হয়। কেননা, যখন পুরুষকে এ রকম আদেশ দেয়া হয়েছে যেন সে ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর সন্ধান করে, তা'হলে অবশ্যই এই আদেশে আনুসঙ্গিক আদেশ হিসেবে এই আদেশও নিহিত রয়েছে যে, মুসলমান নারীগণও যেন ধর্মভীরু ও ধর্মপরায়ণা হয়। কেননা, দুনিয়াতে ধর্মরায়ণা নারীগণই যদি না থাকে তবে পুরুষগণ ধর্মপরায়ণা নারী কোথা থেকে সংগ্রহ করবে? সুতরাং এই হাদীসে অন্যান্য আদেশও অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন ঃ –

১। মুসলমান নারীগণ ধর্মপরায়ণা এবং উন্নত চরিত্রের হোক-নতুবা কোন ধর্মপরায়ণ পুরুষ তাদের বিবাহ করতে রাজী হবে না এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ ধর্মপরায়ণ হবে না।

২। মুসলমান পুরুষগণ ধর্মপরায়ণ এবং উন্নত চরিত্রের নারীগণকে বিবাহ করুক, যাতে তাদের নিজেদের ঘরগুলোই কেবল বেহেশ্‌তের নমুনা না হয় বরং তাদের সন্তান-সন্ততির জন্যেও স্থায়ী বেহেশ্‌তের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ইহা ঐ সাময়িক উদ্দেশ্য যার জন্যে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই চেষ্টা করা উচিত যেন তারা আমাদের প্রভু (সাঃ)-এর এই মোবারক আহ্‌বানকে তাদের চলার পথের দিশারী করে স্থায়ী পথ, স্থায়ী সুখ এবং স্থায়ী বরকতের উত্তরাধিকারী হওয়ার চেষ্টা করে।

পুণ্যবতী জননী পুণ্যবান সন্তান জন্ম দেয়ার একটি উত্তম মাধ্যম

অতঃপর সন্তান–সন্ততির তরবীয়তের ব্যাপারে ইসলামের প্রথম আদেশ হ'ল, কেবল পুরুষই ধর্মপরায়ণা নারী বিবাহ করবে না। কেননা, ধর্মহীনা জননী সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের যোগ্যতা রাখে না ; নিঃসন্দেহে কুরআন মজীদ একথাও বলেছে যে, " ইউখরেজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যেতে ওয়া ইউখরিজুল মাইয়্যেতা মিনাল হাইয়্যে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৮–অনুবাদক) অর্থাৎ কখনও খোদা মৃত থেকে জীবিত সৃষ্টি করে দেন এবং জীবিত থেকে মৃত সৃষ্টি করে দেন।" এইভাবেও কখনো খারাপ পিতা-মাতার সন্তানও ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে এবং কখনো উত্তম পিতা–মাতার ঘরেও খারাপ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌তা'লা একদিকে মুসলমানগণকে সাবধান করার জন্যে এবং অন্যদিকে তাদেরকে শিথিলতা থেকে বাঁচানোর জন্যে কুরআন মজীদে কতকগুলো উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, খারাপ ঘরে উত্তম সন্তান সৃষ্টি হ'ল এবং কখনও একটি উত্তম ঘর থেকে খারাপ সন্তান বের হয়ে আসল। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, ধর্মপরায়ণ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে এবং সন্তানকে তরবীয়ত দেয়ার জন্যে যে যোগ্যতা একজন ধর্মপরায়ণা মা রাখেন তা কস্মিন কালেও এক ধর্মহীনা মা রাখেন না।

বিনীত লেখক অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে হাজার হাজার ঘরের অবস্থা অবলোকন করেছে। সত্যি বলতে কি তাদের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় অবস্থাকে পলে পলে গুপ্তচরের দৃষ্টিতে দেখেছে ; কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফল লক্ষ্য করেনি যে, ধর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দিতে এবং ধর্মপরায়ণ সন্তান গঠন করতে যে সমস্ত বাহ্যিক উপকরণের প্রয়োজন হয় তার দশ ভাগের নয় ভাগই অধিকার করে থাকেন একজন ধর্মপরায়ণা মাতা। উত্তম মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত সন্তান না কেবল দিবারাত্র তার মায়ের ধর্মনিষ্ঠাকে অর্থাৎ নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত, সদকা-খয়রাত, ধর্মের সেবা এবং জামাতের কাজে সম্পদ এবং সময় কুরবানী, খোদা এবং রসূলের জন্যে ভালবাসা, ধর্মের জন্যে গৌরব বোধ ইত্যাদি দেখে বরং যেভাবে সে তার মায়ের পবিত্র কার্যকলাপকে প্রত্যক্ষ করে ঐভাবে তার মা-ও সকাল-সন্ধ্যা

তার কার্যকলাপকে নিরীক্ষণ করে থাকেন। মা প্রত্যেক খারাপ কথা এবং কাজ থেকে তাকে বিরত রাখেন এবং স্নেহ ও মায়া-মাখা কথা দ্বারা তাকে উপদেশাবলী দিতে থাকেন। মায়ের এই কাজ তার সন্তানের জন্যে হৃদয়গ্রাহী দিশারীর নমুনাস্বরূপ। মায়ের এই কথা মধু এবং বিষনাশক অমৃতের ফোঁটার মত তার সন্তানের কানে বর্ষিত হতে থাকে। তার শরীর, মাংস ও হাড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং তার রক্তের সাথে মিশে যায় বরং তাকে একটি নতুন শরীর দান করে। হায় ! যদি দুনিয়া ইহাকে উপলব্ধি করতো, জাতির নেতাগণের যদি ইহা বোধগম্য হতো, বংশের নেতাগণ যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করতো, ঘরের কর্তা যদি ইহা অনুভব করতো, সন্তানের মা যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করতো, হায় ! সন্তানগণই যদি ইহা অনুধাবন করতো যে, মায়ের কোলই হলো উত্তম তরবীয়ত লাভ করার প্রকৃষ্ট জায়গা। অতঃপর হে আহমদীয়তের ময়দানে সংগ্রামরতা ভগ্নীগণ ও কন্যাগণ এবং হে আজিকার মায়েরা এবং আগামী দিনের মায়েরা ! যদি জাতিকে ধ্বংসের গহ্বর থেকে বাঁচিয়ে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে চাও, তবে শুন এবং স্মরণ রাখ যে, এই ব্যবস্থা ছাড়া উত্তম আর কোন ব্যবস্থা নেই। **নিজের কোলকে ধর্মনিষ্ঠার দোলনা সৃষ্টি কর**। নিজের কোলের মধ্যে ঐ রত্ন গঠন করো যা খারাপকে মিটিয়ে দিতে পারে এবং ধর্মনিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠা করে শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে পরম করুণাময় খোদার দিকে টেনে আনতে সক্ষম হয়।

তরবীয়তের সময় আরম্ভ হয় শিশুর জন্মের সাথে সাথে

মায়ের নিজস্ব ধর্মনিষ্ঠার পরেই সন্তানের তরবীয়তের প্রশ্ন উঠে। এই প্রসঙ্গে সবচে' প্রথম প্রশ্ন এই যে, বাচ্চাদের তালীম এবং তরবীয়তের সময় কখন থেকে আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন ? এই ব্যাপারে অধিকাংশ পিতা-মাতাই এই ভয়ানক ভুলের মধ্যে পড়ে আছেন যে, শৈশব তো খেলাধূলার, স্বাধীন এবং বন্ধনহীন জীবন। যখন বাচ্চা বড় হবে তখনই তার তরবীয়তের সময় হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ধ্বংসাত্মক এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আঁ-হযরত (সাঃ) তাকিদ করেছেন যে, একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই

তার কানে আযানের ধ্বনি পৌঁছানো দরকার। কেননা, আযানের কথাগুলির মধ্যে কেবল ইসলামী শিক্ষার আসল কথাগুলি পাওয়া যায় না বরং উহার মধ্যে একটি শক্তিশালী আহ্বানের স্পন্দন থাকে, যার মধ্যে সদ্য-প্রসূত শিশুকে ডাকা হয় ঃ হে শ্রবণকারী, এ দিকে মনযোগ দাও। নামায এবং **মঙ্গলের** রাস্তায় পা ফেলে চলো। অতঃপর রসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আদেশ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের তরবীয়ত তার জন্মের সাথে সাথেই হওয়া উচিত। প্রথমে শিশু কিছু বুঝতেই পারে না। এ রকম ধারণা করাও ভুল। কেননা, প্রথমে কথাগুলি তার বোধগম্য হোক বা না হোক, তথাপি কোন না কোনভাবে তার জন্মের সাথে সাথেই তার অনুভূতি শক্তির অবশ্যই বিকাশ ঘটে এবং স্মৃতি-পটে কিছু জমা থাকে।

ইহা ছাড়াও এই আদেশের মধ্যে পিতা-মাতার জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তোমাদের হিসাবে বাচ্চাদের এই বয়স অজ্ঞানতার বয়স হলেও এখন থেকেই তার তরবীয়তের চেষ্টা করা প্রয়োজন। কেননা, তোমরা জান না যে, কখন থেকে তার জ্ঞানের উন্মেষ হবে। অতঃপর হতে পারে যে, তোমরা তাকে নীরব পুতুল মনে করে কোন পরওয়া কর না আর সে ভিতরে ভিতরে পরিবেশের প্রভাবে খারাপ হতে থাকে। যা হোক ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী শিশুদের তালীম-তরবীয়তের সময় তার জন্মের সময় থেকেই শুরু হয়। ঐ সমস্ত পিতা-মাতা বড়ই হতভাগ্য যারা এই বলে বাচ্চাদের প্রথম কয়েকটি বছরে অবহেলা প্রদর্শন করে যে, এখনও সে তরবীয়তের উপযুক্ত হয়নি। বাচ্চার চোখের সামনে বিষাক্ত এবং লজ্জাহীন কার্যকলাপ চলতে থাকে, এবং অজ্ঞতাবশতঃ মনে করা হয় যে, এখনও সে এ বিষয় বুঝার ক্ষমতা রাখে না। বাচ্চাদের কানে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এবং শরীয়ত-বিদ্বেষী কথাবার্তা পৌঁছে এবং নির্বুদ্ধিতার দরুন মনে করে নেয়া হয় যে, এখন তারা এসব কথা বুঝে না বা জানে না। এই সময়ে তাদের অন্তরে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটি বিষ-বৃক্ষের বীজ বপন করা হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে শিশু সাধারণতঃ এই বীজকে চিনতে পারে না ; কিন্তু বিষ বিষই বটে এবং ভিতরে ভিতরে ইহা আপন কার্য সমাধা করে চলে। সুতরাং সন্তানের তরবীয়তের **দ্বিতীয় শিক্ষা** এই যে, তাদের জন্মের সাথে সাথেই তরবীয়তের প্রতি নজর দাও-যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তোমাদের কথা তার বোধগম্য হোক বা না হোক। তোমরা ধরে নাও যে, সে তোমাদের প্রত্যেক কার্যকলাপ দেখে এবং প্রত্যেক কথা শুনে। ইহা একটি

অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যা আমাদের শরীয়ত আমাদিগকে শিখিয়েছে। ইহা প্রত্যেক মুসলমান মাতার উপর ফরয যে, তারা যেন বাচ্চাদের তরবীয়তের ব্যাপারে প্রত্যেক কার্য-প্রণালীকে এ বিষয়টির আলোকে প্রণয়ন করে। লক্ষ্য কর, ইহা একটি সাধারণ কথা যে, যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করার পূর্বে মেলা-মেশার সময় ভাবী-সন্তানকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্যে খোদার নিকট দোয়া করবে, সেই ধর্ম কি সন্তান জন্মাবার পর কয়েক বৎসর ধরে তার তরবীয়ত ও চারিত্রিক তত্ত্বাবধানের চেষ্টা না করে পারে ? কখনই নহে, কখনই নহে।

কুরআন শরীফ ঈমান এবং কর্মে তরবীয়তের পূর্ণ বিধান

এর পরে সন্তানের প্রত্যক্ষ তরবীয়তের সময় আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে একজন মুসলমানের জন্যে মীমাংসিত প্রশ্ন এই হতে পারে যে, সন্তানগণকে কী তরবীয়ত দেয়া যেতে পারে ? কেননা, আমাদের সকল **চারিত্রিক** এবং **আধ্যাত্মিক তরবীয়ত**, বরং এক দিক দিয়া **শারিরীক** এবং **আর্থিক** তরবীয়তেরও পূর্ণ বিধান কুরআন শরীফের মধ্যে নিহিত রয়েছে। (যার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা বা কর্ম-পদ্ধতি রসূলে খোদা (সাঃ)-এর সুন্নত এবং তাঁর পবিত্র বাক্য **সহীহ হাদীসসমূহে** রয়েছে)। এই পবিত্র বিধানকে জীবন্ত এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্যেই আহমদীয়া জামাতের পবিত্র ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আর্বিভূত হয়েছেন। অতঃপর আমাদের কর্ম-পদ্ধতির ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই নেই। উহা প্রথম থেকেই বিদ্যমান রয়েছে, এবং নিজের স্থায়ী জীবনের বন্দোবস্ত নিয়ে এসেছে। ইহা সেই বিধান আমাদের স্নেহশীলা জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) যে সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"কানা খুলুকুহুল কুরআন" অর্থাৎ সমস্ত কুরআনই তাঁর চরিত্রের রূপায়ণ। তিনি কুরআনের শিক্ষার মূর্তিমান চিত্র হয়ে এসেছিলেন। এই ব্যাপারে খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বলেন, "ওয়া লাকুম ফি রাসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা'–অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ ! তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে

উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে।" (সূরা আহ্যাব ঃ ২২ আয়াত–অনুবাদক) তাই তরবীয়তের বিধান অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রথম থেকেই তা কুরআন এবং রসূলের আদর্শের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তবে সন্তানের তরবীয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত বহু কথার মধ্যে কোনগুলোর প্রাধান্য দিতে হবে সে সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কেবলমাত্র কুরআনের একটি আয়াত এবং একটি হাদীস বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা, এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এর চেয়ে বেশী বলার অবকাশ নেই। কুরআন মজীদের প্রারম্ভেই আল্লাহ্'তালা বলেছেনঃ "যালিকাল কিতাবু লা রায়্বা ফীহে হুদালিল্ মুত্তাকীনাল্লাযীনা ইউমেনূনা বিল গায়েবে ওয়া ইউকীমুনাস্সালাতা ওয়া মিম্মা রাজাকনাহুম ইউনফিকূন–অর্থাৎ কুরআন মজীদ এমন একখানি গ্রন্থ, যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা মুক্তাকীদের জন্যে পূর্ণ পথ–পদর্শক হয়ে এসেছে–যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাযকে ঐকান্তিকতা এবং বিনা ব্যতিক্রমে আদায় করে এবং যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমাদের রাস্তায়) খরচ করতে থাকে।" (সূরা বাকারা ঃ ৩-৪ আয়াত–অনুবাদক)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াত কুরআন মজীদের প্রথমেই এসেছে এবং ইসলামী শিক্ষার এমন সারমর্ম বর্ণনা করেছে যার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সারমর্ম ধারণায় আসতেই পারে না। প্রকাশ থাকে যে, দীন অর্থাৎ ধর্ম তিনটি অংশে বিভক্ত । **প্রথমতঃ, ঈমানের** অংশ যা মৌখিক সাক্ষ্য এবং হৃদয়ের সমর্থনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। **দ্বিতীয়তঃ আমলের** বা কর্মের অংশ যা **হুকুকুল্লাহ্** (আল্লাহ্র প্রাপ্য) এবং **হুকুকুল এবাদ** (বান্দার প্রাপ্য) এই দুই শাখায় বিভক্ত অর্থাৎ কোন কোন কর্তব্য খোদাতা'লার সাথে এবং কোন কোনটি বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এভাবেই ইসলামী শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। কুরআনের উক্ত আয়াতে এই তিনটি অংশ–যেমন, **আল্লাহ্র উপরে ঈমান, আল্লাহ্র হক্** (প্রাপ্য) **এবং বান্দার হক্** সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার আসল রূপায়ন বিধৃত হয়েছে। কুরআন শরীফের প্রথমেই এই আয়াতের উপস্থাপনের দ্বারা ইহার বিশেষত্ব এবং ফযিলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তরবীয়তের ঈমান (বিশ্বাস) বিষয়ক মূল অংশ

ঈমানের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াত এই নিয়ম বর্ণনা করেছে যে, ঈমানের ভিত্তি অদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এমন কোন কোন অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে, যা মানুষের চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতার জন্যে প্রয়োজনীয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী ঈমানের বিষয়-বস্তু এই রকম ঃ যথা–(১) **খোদাতা'লা**, (২) তাঁর **ফিরিশ্‌তাগণ**, (৩) তাঁর **কেতাব সমূহ**, (৪) তাঁর **রসূলগণ**, (৫) **পুরস্কার এবং শাস্তির দিবস** এবং (৬) **অদৃষ্টের ভাল ও মন্দ**। এই বস্তুসমূহের উপর–যা বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু ইহার প্রভাব ও নিদর্শনের মাধ্যমে চিহ্ন দ্বারা অন্তর এবং বিবেক-বুদ্ধির আলোকে দেখা যায়–প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান আনয়ন করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। কেননা, উহাদের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে মানুষের ধর্মের ইমারত এবং মানুষের সৎকর্মসমূহের ভিত্তি পূর্ণতা পেতে পারে না। সুতরাং আহমদী মায়েদের প্রথম কর্তব্য হল, নিজেদের সন্তান–সন্ততিকে ঐ সকল মৌলিক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, যা এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক আহমদী শিশুর মনের মধ্যে এই কথা বদ্ধমূল হওয়া প্রয়োজন যে, আমার একজন খোদা আছেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমার হাকিম ও মালিক এবং নামায ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক আহমদী শিশুর মনে এই কথা গেঁথে যাওয়া উচিত যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে চালানোর জন্যে খোদাতা'লা ফিরিশ্‌তাগণকে সৃষ্টি করেছেন যারা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও লোকদের অন্তরের মধ্যে পুণ্য কাজের জন্যে প্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখেন এবং তারা বিশ্বের সংগঠনের বিভিন্ন অংশকে চালাচ্ছেন। প্রত্যেক আহমদী শিশুর অন্তরের মধ্যে এই কথা বদ্ধমূল হওয়া উচিত যে, খোদাতা'লা দুনিয়ার লোকগণকে পথ-প্রদর্শনের জন্যে বিভিন্ন সময়ে ঐশীগ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং উহাদের মধ্যে শেষ গ্রন্থ এবং শেষ বিধান হল কুরআন মজীদ, যার উপরে আমল ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। প্রত্যেক আহমদী শিশুর হৃদয়-

পটে এই কথা অঙ্কিত থাকা দরকার যে, মানুষকে পথের দিশা দেয়ার জন্যে এবং তাদের জন্যে উত্তম আদর্শ সংস্থাপনার্থে যুগে যুগে খোদাতা'লা রসূল প্রেরণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে **মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (যাঁর জন্যে আমি উৎসর্গীকৃত) শেষ বিধান-ধারী রসূল, যিনি সমস্ত নবীগণের সর্দার এবং খাতামান্নাবীঈন (নবীগণের মোহর) এবং আফযালুর রসূল (শ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ), যাঁর আনিত ধর্মের সেবা এবং পুনরুজ্জীবনের জন্যে আল্লাহ্তা'লা এই যুগে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালামকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর খাদেম (সেবক) বানিয়ে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক আহমদী শিশুর মনের মধ্যে এই কথা বদ্ধমূল হওয়া দরকার যে, মৃত্যুর পরে অন্য একটি জীবন আছে যেখানে শেষ বিচারের জন্যে মানুষকে স্ব স্ব কর্মের জবাবদীহি হতে হবে। সর্বশেষ, সকল আহ্মদী শিশুকে এই কথাও মনে রাখতে হবে যে, আধ্যাত্মিক বিধানের মত দুনিয়ার বস্তুজগতও আল্লাহ্তা'লার সৃষ্ট নিয়ম–কানুনের মাধ্যমে চলছে, যদিও তার ভাল অথবা খারাপ এই দু'টো দিকই আছে।

এই সব কথা প্রত্যেকটি আহমদী শিশুর হৃদয়ে শৈশব কাল থেকেই এমন ভাবে গেঁথে যাওয়া উচিত, যেন পরবর্তী জীবনের যে কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা (উত্থান-পতন) তা যতই প্রবল হোক না কেন, তার আকিদাকে (ধর্ম-বিশ্বাসকে) বিনষ্ট করতে না পারে। উত্তম কথা এবং উত্তম কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক আহমদী শিশুর হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি করা প্রত্যেক আহমদী মায়ের কাজ। ফোঁটা ফোঁটা পানি যদি কঠিন পাথরের মধ্যে স্থায়ী চিহ্ন সৃষ্টি করতে পারে, তবে মায়ের প্রতিদিনকার সকাল-সন্ধ্যার পবিত্র আদর্শ এবং উপদেশাবলী শিশুদের হৃদয়ে অটল ঈমানের সৃষ্টি করবে না কেন ? সুতরাং এখানে এই কথাই এসে যায় যে, মাকে পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণ হতে হবে। আমাদের রসূল (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তা'লার হাজার হাজার রহমত বর্ষিত হোক–তিনি বরাবর বলেছেন, "আলাইকা বেযাতিদ্দীনি তারিবাত ইয়াদাকা" অর্থাৎ হে মুসলিম পুরুষগণ ! তোমাদের জন্যে ইহা ফরয যে, তোমরা ধর্ম–পরায়ণা এবং উত্তম চরিত্রের মেয়েদের বিয়ে কর, অন্যথায় তোমাদের হাত সর্বদা ধূলিমাখা থাকবে।"

কর্মের ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক পুণ্য কাজ

ঈমানের পরে কর্মের সোপান। তজ্জন্য উপরের আয়াত থেকে দু'টি মৌলিক কর্মকে নির্বাচন করা যায়। প্রথমতঃ **নামায** এবং দ্বিতীয়তঃ **'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্'** অর্থাৎ খোদার পথে খরচ করা। প্রকৃতপক্ষে এই দু'টি বিষয়ই **ইসলামের হৃদয়স্বরূপ**। বাকী সব কর্ম এই দু'টি কর্মের শাখা-প্রশাখা এবং এই দু'টি কর্ম থেকে প্রবাহিত ধারা–উপধারা। নামায খোদার উদ্দেশ্যে এবং ইহা খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁর মহান Power Station (শক্তি কেন্দ্র)-এর সাথে বান্দার হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করে। তার হৃদয়ের মধ্যে একটি স্থায়ী আলোক-বর্তিকা জ্বেলে দেয়। অন্যদিকে খোদার রাস্তায় খরচ করা বান্দার প্রাপ্য যার মাধ্যমে না কেবল জামাত এবং জাতির বিভিন্ন কাজ অর্থাৎ তবলীগ, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পন্ন করা যায়, বরং ধনীদের সম্পদের একটি অংশ কেটে নিয়ে গরীবদের অবস্থার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা যায়। যদি চিন্তা করা যায়, তবে এই দু'টি কথা অর্থাৎ 'নামায' এবং 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্' সমগ্র ইসলামী শিক্ষার সারাংশ। ইহার মধ্যে বলা হয়েছে যে, খোদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি কর এবং জামাতের কাজে অংশ গ্রহণ কর, হৃদয়ের মধ্যে খোদার প্রীতির প্রেরণা সৃষ্টি কর, খোদা-প্রদত্ত রিয্ক (জীবনোপকরণ) থেকে জাতি এবং নিজ ভাইয়ের অংশ বের করে দাও। পুনঃ "মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফেকূন" (অর্থাৎ, ধর্মপরায়ণ লোক আমাদের দেয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে থাকে)–কথা দ্বারা এই ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, নিজে কেবল সম্পদ খরচের প্রতিই লক্ষ্য রেখো না বরং ঐ প্রতিটি জিনিস যা খোদার নিকট থেকে তুমি পেয়েছ তা থেকে খোদা এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য আদায় কর। এখন দেখ, যেভাবে সম্পদ খোদা-প্রদত্ত রিয্ক, তেমনিভাবে মানবিক শক্তিও খোদা-প্রদত্ত রিয্কের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সময়ও খোদা-প্রদত্ত রিয্ক। মানুষের জ্ঞানও খোদা-প্রদত্ত রিয্ক। সুতরাং "মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফেকূন" নির্দ্দেশের চাহিদা ইহাই যে, প্রত্যেক প্রকারের রিয্ক থেকে খোদা এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য বের কর, সম্পদ থেকে যাকাত, সাদকা এবং চাঁদা দাও। হৃদয় ও জ্ঞানের শক্তি দ্বারা ধর্ম, দেশ ও জাতির সেবা কর। সময়ের কিছু অংশ ধর্মীয় এবং জামাতের কাজে ব্যয় কর এবং খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা দুনিয়ার উপকার কর।

নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং খোদার পথে খরচ করা

অতঃপর ঈমান প্রতিষ্ঠা করবার পর মায়েদের প্রথম কাজ ইহাই যে, তারা যেন নিজ সন্তান-সন্ততির মধ্যে দু'টি মৌলিক পুণ্য সৃষ্টি করার জন্যে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ বাল্যকাল থেকেই যেন তাদের হৃদয়ে নামাযের জন্যে ভালবাসা জন্মায় এবং নামাযের অভ্যেস করায়, যাতে সর্বদা খোদার সাথে তাদের হৃদয়ের সংযোগ থাকে। দ্বিতীয়তঃ তারা বাচ্চাদের মধ্যে এ অভ্যেসের সৃষ্টি করে যেন বাচ্চারা সমাজ এবং জমাতের কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং যতই নগণ্য হোক না কেন নিজ হাতে কিছু না কিছু চাঁদা হিসেবে আদায় করে এবং নিজের সময় ও খোদা-প্রদত্ত শক্তির কিছু অংশ জামাতের কাজে ব্যয় করে।

অভ্যন্তরীণ প্রেরণা হিসেবে নামায পড়তে গিয়ে তাদের হৃদয়ে যেন এই ধারণার সৃষ্টি হয় (এই ধারণা সৃষ্টি করা মায়েদের কাজ) যে, তারা খোদার সামনে খাড়া হতে যাচ্ছে, তিনি তাদের দেখছেন। চাঁদা দিতে গিয়ে যেন মনে করে যে, তারা তাদের জাতি এবং জামাতের বোঝা হালকা করছে। যদি এই দু'টি বাহ্যিক কর্ম এবং এই দু'টি অভ্যন্তরীণ প্রেরণা আহমদী মায়েদের মাধ্যমে আহমদী সন্তানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে খোদার ফযলে আমাদের জামাতের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। এই জন্যেই কুরআন মজীদ প্রারম্ভেই এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে আদেশ বর্ণনা করেছে যে, এ দু'টি কর্ম ইসলামের হৃদয়, যদ্বারা মুসলমান শিশুদের তরবীয়ত হওয়া উচিত। প্রত্যেক আহমদী শিশু নামাযের পাবন্দ এবং ইহার আকাঙ্খী হোক। প্রত্যেক আহমদী শিশু যেন নিজেকে একটি খোদায়ী জামাতের একজন সদস্য মনে করে, এর কাজে অংশ গ্রহণের উন্মাদনা রাখে। ইহা ঐ দু'টি শক্তিশালী খুঁটি যার সাথে বন্ধনের মাধ্যমে প্রত্যেক শিশু সর্ব প্রকার বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। উহার একটি রজ্জু খোদার নিকট থেকে পাওয়া যায়, যা একটি সুদৃঢ় চিরস্থায়ী অবলম্বন এবং উহার দ্বিতীয় রজ্জু জামাত থেকে পাওয়া যায়, যা তার জন্যে একটি মজবুত দুর্গের চেয়ে কম নয়। অতঃপর, হে আহমদী মাতৃবর্গ ! হে ইসলামের কন্যাগণ ! আজ থেকে শপথ নাও যে, তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে অবশ্যই এই পুণ্য কাজ দু'টি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদেরকে নামায এবং দোয়ার পাবন্দ রূপে তৈরী করতে হবে। তাদেরকে খোদায়ী জামাতের সদস্য হতে হবে এবং তাদের মধ্যে সময় এবং আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করতে

হবে। দেখ, আমাদের আঁ-হযরত (সাঃ) রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রথমে একটি জিনিস দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, মুসলমানগণ উহার মর্যাদা দান করেনি ! তিনি বলেছিলেন, যে মুসলমান তার দু'টি অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিবে, **(একটি জিহ্বা এবং অপরটি গুপ্তাঙ্গ)** আমি ঐ মুসলমানের জান্নাতের জিম্মাদার হব। কিন্তু এখানে তোমাদের প্রভুর প্রভু, দুনিয়ার এক–অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু খোদা, যাঁর হাতে পৃথিবী এবং আকাশের ভাণ্ডারের চাবি তিনি একটি ইবাদতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিচ্ছেন। উহাকে প্রথমে গ্রহণ কর। তিনি বলেছেন "আল্লাযীনা ইউকীমুনাস্‌সালাতা ও মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফেকূন . . . .উলায়েকা 'আলা হুদাম্মের রাব্বেহিম ওয়া উলায়েকা হুমুল মুফলেহূন" অর্থাৎ যারা নামাযের পাবন্দী করে থাকে এবং আমাদের দেয়া রিয্‌ক থেকে ধর্ম এবং জামাতের প্রয়োজনের তাগিদে খরচ করে . . . . তারাই আমাদের নিকট থেকে হেদায়াত-প্রাপ্ত এবং অবশ্যই পরিশেষে তারাই সফলতা লাভ করবে"।

হে আহমদী মায়েরা ! ইহা ঐ রক্ষা-কবচ যা তোমাদের শিশুদের চিরস্থায়ী হেফাযতের জন্যে পৃথিবীর এবং আকাশের খোদা পেশ করেছেন। উহাকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ কর, উহার চেয়ে অধিক দৃঢ় এবং সস্তা পণ্য তোমরা কখনও পাবে না। ঐ রক্ষা-কবচ কী ? তা হলো **নামায এবং খোদার পথে খরচ করা।**

তিনটি প্রধান পাপ

পুনরায় ধর্মের ভিত্তিকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মজবুত করার জন্যে আঁ-হযরত (সাঃ) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা মূলতঃ আত্ম-সংশোধনের সকল দর্শনের চাবিকাঠি। যেমন বলেছেন, আলা উনাব্বেয়ুকুম বে আকবারিল কাবায়েরে সালাসান–কালূ বালা ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ কালা আল্‌ ইশরাকু বিল্লাহি ওয়া উকূকুল ওয়ালেদাইনে ওয়া জালাসা ওয়া কানা মুত্তাকিয়ান ফাকালা আলা ওয়া কাওলায্‌যূরে ফামা যালা ইউকার্‌রিরুহা হাত্তা কুলনা লায়তাহূ সাকাতা"–অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! আমি কি তোমাদেরকে সবচে' বড় গুনাহ সম্বন্ধে অবহিত করব না"। তিনি এই কথা তিনবার বলেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি অবশ্যই আমাদিগকে ঐ

বিষয়ে অবহিত করুন"। তিনি বললেন, "তোমরা শুনে রাখ যে, সবচে' বড় গুনাহ **খোদার সাথে শির্ক করা** এবং তার পরে সবচে' বড় গুনাহ **পিতা-মাতার সেবায় অবহেলা প্রদর্শন করা** এবং এর পরে এই কথা বলার সময় তিনি তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসলেন এবং দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ সবচে' বড় গুনাহ্ **মিথ্যা কথা বলা"**। এই কথা তিনি এত বার বললেন যে, হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন, পাছে তার কষ্ট হয় এই জন্যে আমরা ভাবছিলাম যে, তিনি যেন এই কথা বলে আর কষ্ট না করেন।" (হযরত আবূ বকরের বর্ণনায় বুখারী)

বাহ্যিক এবং গুপ্ত শির্ক

এই তাৎপর্যপূর্ণ হাদীস এমন তিনটি মূল আদেশের উপর কার্যকরী হয়েছে যা বাচ্চাদের তরবীয়তের মধ্যে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ শির্ক অর্থাৎ খোদার নামের বা গুণের সাথে অংশী করা বা তুলনা করা। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠাকুর দেবতার সামনে মস্তক অবনত করার মাধ্যমে যে শির্ক করা হয় তা ইসলামের একত্ববাদের প্রভাবে দুনিয়া থেকে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অনেক মুসলমান এক প্রকার গুপ্ত শির্কের শিকার হয়েছে। গুপ্ত শির্ক বলতে এটা বুঝায় যে, কোন এমন সম্মান যা কেবল খোদারই প্রাপ্য তা অন্য জিনিসকে দেয়া, অথবা কোন জিনিসের সাথে এই রকম সম্পর্ক সৃষ্টি করা যা কেবল খোদার জন্যেই করা উচিত, অথবা কোন জিনিসের উপর এমন ভরসা করা যা কেবল খোদার উপরই হওয়া উচিত। ইসলাম দীন এবং দুনিয়ার বিভিন্ন কাজের জন্যে বাহ্যিক প্রচেষ্টা অবলম্বন করা থেকে অবশ্যই বিরত করেনি—যদিও বাহ্যিক উপকরণও খোদাতা'লার দান। ইসলাম তার জন্যেও নির্দ্দেশ দান করছে। কিন্তু ইসলাম উহার ভরসা করতে অথবা উহাকেই চরম সাফল্যের উপকরণ মনে করা থেকে বারণ করেছে এবং খুব কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। সুতরাং আহ্মদী মায়েদের তথা পুণ্যবতী এবং ধর্মপরায়ণ মায়েদের জন্যে ইহা ফরয যে, তাদের শিশুদের মধ্য থেকে এই গুপ্ত শির্ক, যা এই যামানাতে অসংখ্য আত্মাকে ধ্বংস করছে, মূল ভিত্তি থেকে বের করে ফেলে। এবং তাদেরকে পার্থিব প্রচেষ্টা অবলম্বন করার পরও সকল অবস্থাতে খোদাতা'লার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় এবং খোদাতা'লার উপর ভরসা করতে শেখায়। বিনীত লেখক

এমন ধর্মপরায়ণা মাকে দেখেছে (আসলে সব মা-ই যদি এরকম হতেন !) যে, তিনি একদিকে যেমন রুগ্ন বাচ্চাকে ঔষধ দিচ্ছেন অপর দিকে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বাচ্চাকে বুঝাচ্ছেন-এই ঔষধ সেবন কর, কেননা, ইহা খোদাতা'লার দান, কিন্তু আরোগ্য দান করার মালিক একমাত্র খোদাতা'লা। এইজন্যে ঔষধও সেবন কর এবং যাতে তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন সেজন্যে দোয়াও কর। বাচ্চার পরীক্ষা নিকটবর্তী, মা তাকে ভালবাসার সাথে বুঝাচ্ছেন-মুল্যবান সময় নষ্ট করো না, বরং ভালভাবে পড়াশুনা কর, কিন্তু সাথে সাথে বুঝিয়ে দেন যে, খোদার ফযলেই তুমি কেবল উত্তীর্ণ হতে পার-যদিও এই উপকরণ আল্লাহ্‌তা'লারই সৃষ্টি। সুতরাং পড়াশুনা কর এবং খোদাতা'লার ফযলের জন্যেও প্রার্থনা কর। নবীন বয়স তাদের। ছোট বয়সেই যদি তাদের হৃদয়ে সত্যিকার তৌহীদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে পরের কোন ঝড়-ঝঞ্ঝাই উহাকে ধ্বংস করতে পারে না।

পিতা-মাতার সেবায় অবহেলা প্রদর্শন না করা

ঐ হাদীসের দ্বিতীয় হেদায়াত হ'ল **পিতা-মাতার সেবায়** অবহেলা প্রদর্শন না করার ব্যাপারে-যাকে ইসলাম শির্‌কের পরে দ্বিতীয় নম্বরের গুনাহ্ বলেছে। স্মরণ রাখা দরকার যে, পিতা-মাতার সেবার প্রতি অবহেলা দেখান শুধু পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াই নয় বরং তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়া এবং তাদের খেদমত না করারও অন্তর্ভুক্ত। বরং আসল কথা এই যে, এখানে পিতা-মাতা শব্দ উদাহরণস্বরূপ রাখা হয়েছে কেননা অন্যান্য, হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সকল প্রকার সম্মানিত বুযুর্গের প্রতি শিষ্টাচারী এবং শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে, যার মধ্যে পিতা-মাতাকে বিশেষ স্থান দেয়া হয়েছে। সুতরাং পুণ্যবতী মায়েদের কর্তব্য এই যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শৈশব থেকেই পিতা-মাতাসহ সকল বয়স্কদের শ্রদ্ধা করতে শিখাবেন। দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু, খালা-খালু, নানা-নানী, মামা-মামী, বড় ভাই, বড় বোন, বংশের বড়দের, জাতির সম্মানিতদের এবং দেশের সম্মানিতদের প্রত্যেকের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা এবং সকলকে সম্মান দেখান ইসলামী শিষ্টাচারের প্রাণ। আহমদী মায়েদের ইহা অবশ্যই কর্তব্য যে, নিজ সন্তানদের মধ্যে এই গুণের প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা। এই কথা কতই না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, "আত্তারীকাতু কুল্লাহা আদাবু" অর্থাৎ

ধর্মের সকল পথ শিষ্টাচারের মাঠ থেকে বহির্গত। আসল কথা ইহাই যে, আত্ম-সংশোধনের বিশেষ উপকরণ হ'ল শিষ্টাচার। কেননা, যে শিশু বুযুর্গগণের সম্মান করে সে-ই তাদের উপদেশাবলী শ্রবণ করে এবং উহা থেকে উপকৃত হয়। তাই ঐ সকল মায়েদেরই সৌভাগ্য যারা নিজ সন্তানদের মধ্যে শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। কেননা, কেবল এই একটি পদক্ষেপের ফলেই তাদের তরবীয়তি প্রচেষ্টার এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়।

মিথ্যা কথা না বলা

তৃতীয়তঃ এই হাদীসে **মিথ্যা** কথা না বলা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে-যাকে ইসলাম তিন নম্বরের গুনাহ্ বলে নির্ধারণ করেছে। আমাদের প্রভু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মিথ্যার উপর এত ঘৃণা ছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে সত্যবাদিতা এবং সরলতার অভ্যেস সৃষ্টি করতে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এত উদ্বেগ ছিল যে, এই হাদীস বর্ণনা করার সময় মিথ্যার বিপক্ষে নসিহত করতে গিয়ে তিনি উঠে বসে গিয়েছিলেন এবং বার বার এই উক্তি করেছিলেন "আলা ওয়া কাওলায্যূর" "আলা ওয়া কাওলায্যূর" অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রীয়কে সজাগ করে মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর যে, ইসলামে শির্ক এবং পিতা-মাতার সেবা না করার চেয়েও **মিথ্যা** বলা বেশী গুনাহ্র কাজ।

বস্তুতঃ মিথ্যা কেবল নিজের অস্তিত্বের মধ্যেই খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটি গুণাহ্ নহে বরং অন্য গুণাহসমূহের জন্ম-দাত্রী এবং ঐগুলোর উপরে আচ্ছাদন দিবার একটি অপকৌশল বটে। যে লোক মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, যে দ্রুত মিথ্যা কথা দ্বারা তার পাপকে ঢেকে ফেলতে পারে এবং এইভাবে তার হৃদয়ে ভবিষ্যতে অধিক গুণাহ্ করার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে গুণাহ করার এমন একটি অপবিত্র চক্র সৃষ্টি হয় যে, উহার ফাঁসে আটকে গেলে সে সহসা নিষ্কৃতি পায় না।

এই ব্যাপারে অন্য আর একটি হাদীস আছে। কোন এক সময় আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি দুর্বল এবং একটি সামান্য গুণাহর উপরেও বিজয়ী হওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। আপনি আমাকে এমন একটি গুনাহ্র কথা বলে দিন, যা আমি তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেব। তিনি বল্লেন, **"মিথ্যে কথা বলা ছেড়ে দাও"**। যেহেতু

এরপর সে নিজের অন্যান্য গুণাহের উপর আচ্ছাদন দিতে পারল না সে জন্যে এই মূল্যবান নসিহতের কল্যাণে ঐ ব্যক্তি এক পদক্ষেপেই সকল গুনাহের উপর বিজয়ী হল। তাই আহমদী মায়েদের ইহা একটি পবিত্র ফরয যে, তারা নিজ নিজ সন্তানদেরকে মিথ্যার উপর এমন ঘৃণা পোষণ করতে শিক্ষা দেন, যেন যত ক্ষতির সম্মুখীনই তারা হোক না কেন বা যত লোভের বশবর্তীই তারা হোক না কেন, তারা সর্বদা একটি শক্তিশালী প্রস্তরের মত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহা এমন একটি মৌলিক গুণ যা সন্তানদের চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। সত্য কথা--বলে এমন শিশুদের মাথা কখনও নীচু হয় না, বরং সকল অবস্থাতে সকল মজলিসে তাদের মাথা উঁচু থাকে। আসল কথা ইহাই যে, ইসলাম এবং সত্য কথা বলা একই অর্থবোধক হওয়া উচিত। এক ব্যক্তির আহমদী হওয়ার অর্থ এই কথার দায়িত্ব স্কন্ধে বহন করে নেয়া যে, সে নিজে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মিথ্যা কথা কখনও মুখে আনবে না। হায়, এই রকমই যদি হত ! আহমদীয়ত এবং সত্যতা যদি আমাদের অভিধানে একই শব্দে রূপান্তরিত হত !

সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার দোয়া

এই পর্যন্ত আমি বাহ্যিক উপকরণের ভিত্তিতে ইসলামী তরবীয়তের বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা করেছি। কিন্তু যেহেতু বাহ্যিক ব্যবস্থার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে এজন্যে আমাদের আঁ-হযরত (সাঃ) উত্তম ভাষায় এই অভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, "সালাসুদ্ দা'ওয়াতেন মুসতাজাবাতেন লা শাক্কান দা'ওয়াতুল মাযলুমে ওয়া দা'ওয়াতুল মুসাফিরি ওয়া দা'ওয়াতুল ওয়ালেদে লে ওলাদিহি। অর্থাৎ খোদার ফযলে তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। **প্রথমতঃ** মযলুমের (অর্থাৎ যার উপর যুলুম করা হয়) দোয়া-যখন সে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খোদাকে ডাকে। **দ্বিতীয়তঃ** মুসাফেরের দোয়া যখন সে সফরের কষ্টে এবং সফরের যাতনায় খোদার দরবারে মিনতি করে এবং **তৃতীয়তঃ** পিতামাতার হৃদয় নিংড়ানো দোয়া যা তাদের সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্যে করা হয়।"

আসল কথা এই যে, সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার দোয়া অমৃতের কাজ করে থাকে। কেননা, দোয়ার কবুলিয়তের জন্যে যে রকম হৃদয়ের প্রেরণা

এবং মননশীলতার প্রয়োজন হয় তার সবটুকুই পিতা-মাতার দোয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং তরবীয়তের বাহ্যিক উপকরণের প্রয়োগ ছাড়াও ইসলাম এই মূল্যবান হেদায়াত প্রদান করেছে যে, পিতা-মাতা যেন সর্বদা সন্তানের জন্যে দোয়ায় রত থাকে এবং তাদের জন্যে খোদার দরগাহে পড়ে থাকে, দীন এবং দুনিয়ার হাসানাৎ অর্থাৎ কল্যাণসমূহের অধিকারী হয়। আমি জানি না যে, কোন ধর্মপরায়ণা মাতা নিজের সন্তানের জন্যে দোয়া করাতে অবহেলা প্রদর্শন করেন কিনা। যদি কেউ করে থাকেন তবে এর চেয়ে বড় অন্যায় এবং বঞ্চনা আমার ধারণায় আর কিছুই হতে পারে না। আহমদী মায়েরা দোয়ার মর্যাদা এবং শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হোক এবং এই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা-পত্রের মাধ্যমে নিজেদের সন্তান সন্ততিদের ধর্মীয় এবং পার্থিব মঙ্গল করার চেষ্টা করুক। এই ব্যবস্থা-পত্র অতি কার্যকরী এবং অতি প্রাচীন এবং সকল নবী এবং সকল ওলীগণ কর্তৃক পরীক্ষিত। অতঃপর "আয় আযমানেওয়ালে ইয়ে নোস্‌খা ভি আযমা।" অর্থাৎ হে অনুসন্ধানকারী! এই ব্যবস্থা-পত্রটিও অনুসন্ধান করে দেখ।

উল্লিখিত দশটি সোনালী তরবীয়ত-নীতির সারাংশ

মোট কথা এই যে. বাচ্চাদের সঠিক তরবীয়তের জন্যে ইসলাম নিম্নলিখিত দশটি মৌলিক কড়াকড়ি আদেশ দান করেছে ঃ

প্রথম ঃ মুসলমান বিবাহযোগ্য পুরুষদের উত্তম চরিত্রের নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া দরকার যেন তাদের ঘরে তাদের দাম্পত্য জীবনই কেবল বেহেশ্‌তের নমুনা না হয় বরং তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে পবিত্র আদর্শ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ী কল্যাণের সোপানের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় ঃ প্রত্যেক নারী যেন নিজে ধর্মপরায়ণা হয়। সে যেন ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে এবং ধর্মীয় নির্দ্দেশ মোতাবেক নিজের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করে যেন ঐ ঘরের চারি দেয়ালের মধ্যে ধর্ম চর্চা প্রতিষ্ঠায়, ধর্মীয় জ্ঞান দানে এবং ধর্মীয় অনুশাসনে নিজেদের জীবনকে পেশ করার মাধ্যমে নিজেদের সন্তান-সন্ততির জীবন শৈশব থেকেই ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং পবিত্রতার পথে ঢেলে দেয়া যায়। উত্তম সন্তান-সন্ততির জন্যে আদর্শ জননীর অস্তিত্ব একটি বিশেষ মৌলিক জিনিস এবং অমৃতের কাজ করে থাকে। হায় ! যদি দুনিয়া ইহা হৃদয়ঙ্গম করত !

তৃতীয় ঃ শিশুদের জন্মের প্রারম্ভ থেকেই তাদের তরবীয়ত শুরু হওয়া প্রয়োজন এবং যদিও বাহ্যতঃ তারা পিতামাতার কথা বুঝে বা না বুঝে অথবা বাহ্যতঃ তারা তাদের দৃষ্টি-শক্তি এবং শ্রবণ-শক্তির ব্যবহার শিখে বা না শিখে, পিতা মাতার এ বিষয়ে জেনে রাখা দরকার যে, তারা আমাদের সকল কার্য দেখছে এবং আমাদের সকল কথা শুনছে এবং আমাদের সকল কথার প্রভাব তাদের উপরে পড়ছে। শিশুদের জন্মের সাথে সাথেই ইসলাম তাদের কানে 'আযান' দেয়ার মাধ্যমে এই মনস্তাত্বিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছে।

চতুর্থ ঃ মায়েদের উচিত যেন শৈশব থেকেই নিজেদের শিশুদের হৃদয়পটে **"ঈমান বিল-গায়েব"** অর্থাৎ অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের ধারণা বদ্ধমূল করেন। তাদের মনের মধ্যে এই কথা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেন যে, একটি রূহানী এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার রশ্মিসমূহ একটি অদৃশ্য পর্দার আড়ালে থেকে এই বাহ্য-জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে যার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ খোদাতা'লার অস্তিত্ব। বাকী শাখাসমূহ হচ্ছে ফিরিশ্তাগণের অস্তিত্ব, ঐশীবাণীর ধারাসমূহ, রসূলগণ, আখেরাত এবং ভাল ও মন্দের নিয়তি। যে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে জানতে পেরেছে তার জন্যে জন্ম-মৃত্যুর দর্শন একটি উম্মোচিত রাজকীয় ফরমানের মত তার সামনে প্রতিভাত হয়েছে।

পঞ্চম ঃ মায়েদের উচিত যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে শৈশব থেকেই নামাযের পাবন্দ বানায় এবং নামাযের মূল তত্ত্বসমূহ এবং উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষা দেয়। কেননা, কর্ম জীবনে নামায স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে ঐ রকম একটি যোগ-সুত্র যদ্বারা হৃদয়ের দীপশিখা অনির্বাণ থাকে এবং যে জন্যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার একটি গুপ্ত সূত্রের মাধ্যমে খোদার সাথে আবদ্ধ থাকে। যে মা তার সন্তান-সন্ততিকে নামাযের পাবন্দ বানিয়েছেন এবং তার হৃদয়ের মধ্যে নামাযের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছে ঐ সন্তান ধর্মকে এ রকম একটি হাতলের সাথে আবদ্ধ করে যা কখনও ভেঙ্গে যাবার নয়। এই রকম সন্তান খোদার কোলের মধ্যে থাকে এবং তার মা খোদার চিরস্থায়ী ছায়ায় অবস্থান করে। কর্মের জগতে এই বাচ্চার পাঠ হলো প্রথম পরিচ্ছেদের কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে সকল পুস্তক তার অধ্যয়ন করা হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ ঃ মায়েদের উপর ফরয যেন শৈশব থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে **'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্'** অর্থাৎ ধর্মের জন্যে নিজেদের সম্পদ, নিজের সময় এবং নিজের শক্তি ব্যয় করার অভ্যেস সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে এই অভ্যেস সৃষ্টি করে যেন, যে সমস্ত জিনিস তারা খোদার তরফ থেকে লাভ করেছে তা সম্পদ হোক আর হৃদয় বা জ্ঞানের শক্তি হোক না কেন, অথবা জ্ঞান বা জীবন-কাল–এই সকল কিছুর মধ্য থেকে খোদা এবং জমাতের অংশ বের করে এবং বিশেষ করে তারা যেন শৈশব থেকেই নিজেদের হাতে চাঁদা দানে এবং দুঃস্থদের সাহায্যার্থে এবং জামাতের কাজে নিজেদের দৃষ্টি নিয়োজিত করার এবং নিজের সময়ের কিছু অংশ ব্যয় করার অভ্যেস সৃষ্টি করে। এই আদেশ নামাযের পরে ইসলামের দ্বিতীয় সোপান। ইহা ব্যতিরেকে কোন লোক ঐশী-ব্যবস্থার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে পারে না।

সপ্তম ঃ মায়েদের কর্তব্য তারা যেন নিজ সন্তানদিগকে **গুপ্ত শির্কের** গুহায় প্রবিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে সর্বদা সাবধান করেন। দুনিয়ার বাহ্যিক প্রচেষ্টা চালাবার সাথে সাথে তাদের হৃদয় সর্বদা ঐ জীবন্ত ঈমানের সাথে সংযুক্ত রাখা উচিত যেন সকল প্রচেষ্টার পিছনে খোদার হাত কাজ করে এবং "ওহ্ হোতা হ্যা জো মন্‌যূরে খোদা হোতা হ্যা" অর্থাৎ তাই হয়ে থাকে যা খোদা মঞ্জুর করেন।

অষ্টম ঃ শিশুদিগকে পিতামাতা, আত্মীয়–অনাত্মীয় এবং পরিচিত –অপরিচিত নির্বিশেষে সকল বুযূর্গগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিখানো উচিত। শিষ্টাচার ইসলামী রীতিনীতির প্রাণ। বাচ্চাদের মধ্যে বিশেষভাবে পিতা-মাতার আদেশ পালন, তাদের সেবা করা এবং তাদেরকে সম্মান দেখানোর প্রেরণা সৃষ্টি করা উচিত। এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন আমাদের প্রভু (সাঃ) দুই নম্বর গুণাহের মধ্যে শামেল করে দিয়েছেন।

নবম ঃ আহমদী মায়েদের জন্যে ইহা ফরয যেন তারা তাদের শিশুদের মধ্যে **সত্য কথা বলার অভ্যেস** সৃষ্টি করেন। সত্যবাদিতা সকল পুণ্যের উৎস এবং মিথ্যা সকল অন্যায়ের জন্মদাত্রী। সত্যবাদী শিশু খোদার প্রিয়, জাতির আভরণ, বংশের গৌরব। চরিত্রের মধ্যে হীনতা সৃষ্টির ব্যাপারে এবং হৃদয়ের মধ্যে পাপের অপবিত্র প্ররোচনা সৃষ্টি করার ব্যাপারে মিথ্যা ভাষণের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই।

দশম ঃ পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য যেন তারা খোদার দরবারে সর্বদা নিজ সন্তানদিগের জন্যে বিশেষভাবে দোয়ায় রত থাকেন যাতে তিনি তাদেরকে সর্বদা পুণ্য পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, ধর্মীয় এবং পার্থিব উন্নতি দান করেন এবং সর্বোপরি তাদের হাফেয (রক্ষাকর্তা) এবং নাসের (সাহায্যকারী) হন।

ইহা ঐ দশটি মৌলিক কথা, যা সন্তানের তরবীয়তের জন্যে সবিশেষ জরুরী। ইহা ঐ বীজ, যা প্রত্যেক আহমদী মায়ের হাত দিয়ে প্রত্যেক আহমদী শিশুর হৃদয়ে বপন করে দেয়া উচিত। নতুবা জামাতের উন্নতি অসম্ভব।

আহমদী মায়েদের নিকট আকুল আবেদন

হে আহমদী মায়েরা ! তোমাদের উপর এক গুরু-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তোমাদের জাতির ঐ কচি চারাগাছ, যা আজকের শিশু, কালকের যুবক ; আজকের পুত্র কালকের পিতা, আজকের অনুসারী কালকের দিশারী, আজকের শাসিত কালকের শাসক অচিরেই তাদের হাতে কাজের গুরুভার ন্যস্ত হবে। তাই নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হও। বাচ্চাদের জীবন এমন একটি ছাঁচে ঢেলে দাও যেন তাদের পালা আসলে তারা ঐশী–নির্দেশের উপরে উজ্জ্বল তারকার মত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত নও, কিন্তু তোমাদের প্রভু এবং খোদার প্রিয় বান্দা (সাঃ) তোমাদের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত এবং তোমাদিগকে নিজের প্রিয় অস্তিত্বের তুল্য মর্যাদা দান করেছেন। তাই এই মহান কল্যাণের মর্যাদা দান কর এবং প্রিয় খোদার প্রিয়ভাজন হও। ঐ দায়িত্ব পালন কর যা খোদা তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছেন। এই দায়িত্ব বড়ই গুরু। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, এই রাস্তার প্রতিটি পদক্ষেপে খোদাতা'লার ফযল এবং রহমতের ছায়া তোমাদের মাথার উপরে থাকবে, তাঁর পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর ও তাঁর মসীহ (আঃ)-এর পবিত্র দোয়াসমূহ তোমাদের সাথী হবে।

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু খোদা, হে আমাদের আসমানী প্রভু, দুর্বলকে শক্তি দানকারী খোদা ! তুমি আহমদী মায়েদের হৃদয়ের মধ্যে এই প্রেরণা সৃষ্টি করে দাও যেন তারা প্রথম পর্যায়ের সাহাবীয়াদের ন্যায় নিজ

সন্তানদিগকে তোমার এক পবিত্র আমানত মনে করে তাদের তালীম এবং তরবীয়তকে এমন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে যা তোমার সন্তুষ্টি, ইসলাম এবং আহমদীয়তের উন্নতির কারণ হয়। আহমদী শিশুদিগকেও সেই সৌভাগ্য দান কর যেন তারা নিজ পুণ্যবতী মায়েদের তরবীয়তি কার্যক্রমকে 'সালেহ' (পুণ্যাত্মা) এবং 'সলীম' (সুবোধ) বাচ্চাদের মত গ্রহণ করে। এই দোয়া যেন সকল আহমদী পিতা-মাতার মুখে থাকে, "রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া জুর্‌রিয়াতেনা কুর্‌রাতা আইওনেন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা। রাব্বানা ও আতেনা মা ওয়াদতানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখজিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতে ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ" "অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের স্ত্রীগণকে এবং বাচ্চাদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানোর উপকরণ করে দাও এবং আমাদিগকে তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীতির) উপরে প্রতিষ্ঠিত বংশধর দান কর। হে আমাদের প্রভু ! আর তুমি আমাদিগকে ঐ কল্যাণসমূহ দান কর, যে সম্বন্ধে তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে অপদস্থ এবং অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা করো। তুমি নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি পালনকারী পরম দয়ালু প্রভু। আমীন–ইয়া আরহামার রাহেমীন। ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। (কবুল করো হে করুণাকারীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী! আর আমাদের শেষ আহ্বান সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা–অনুবাদক)

বিনীত লেখক
ইসলাম এবং আহমদীয়তের এক নগণ্য সেবক
মির্যা বশীর আহ্‌মদ
জানুয়ারী – ১৯৫৩ইং

পরিশিষ্ট - ১

[আদর্শ জননী হতে হলে একজন মাকে অবশ্যই পর্দার বিধি-বিধান যথার্থভাবে পালন করতে হবে। তাই পর্দার গুরুত্ব বুঝার জন্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক ভাষণের অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হলো−−অনুবাদক]

"তুমি মোমেনদিগকে বলে দাও যে, তারা যেন নিজেদের চক্ষু নীচু করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। ইহা তাদের জন্যে অতি পবিত্রতার কারণ হবে। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্‌তা'লা ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ−রূপে জ্ঞাত আছেন। আর মোমেন মহিলাদিগকে বলে দাও যে, তারাও যেন নিজেদের চক্ষু নীচু করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল মাত্র ঐগুলি ছাড়া যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং তারা নিজদের বক্ষ: আবৃত করে যেন চাদর পরিধান করে। এবং তারা কেবল নিজেদের স্বামী অথবা নিজেদের পিতা অথবা নিজেদের স্বামীদের পুত্র অথবা নিজেদের ভ্রাতা অথবা নিজেদের ভ্রাতাদের পুত্র অথবা নিজেদের ভগ্নীদের পুত্র অথবা নিজেদের সসমর্যাদা-সম্পন্ন মহিলা অথবা তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে অথবা এইরূপ অধীনস্থ পুরুষ যারা এখনও যুবক হয় নি অথবা এইরূপ ছেলে যারা মহিলাদের বিশেষ সম্পর্কের জ্ঞান অর্জন করে নি−এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে। এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত আর কারও নিকট প্রকাশ করা চলবে না। এবং নিজেদের পদদ্বয় (পৃথিবীর উপরে জোরে) এজন্যে ফেলবে না যে, ঐ জিনিষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে যাকে তারা নিজেদের সৌন্দর্যের মধ্যে আবৃত রেখেছে। আর হে মোমেনগণ ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি মনোযোগী হও, যাতে তোমরা সফলকাম হয়ে যাও।" (সূরা নূর ঃ ৩১−৩২ আয়াত)

.... আমি কিছুকাল যাবৎ অনুভব করছি যে, ইসলামের উপরে যে সকল অত্যন্ত বড় বিপদাবলী পতিত হচ্ছে উহাদের মধ্যে বেপর্দেগী একটি বিপদ। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন বাহানায় এই বিপদ মুসলমান মহিলাগণের উপরে আপতিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মুসলমান মহিলাগণ পর্দা পরিত্যাগ করেছে। এমন কি কোন কোন মুসলমান দেশে তো এই ফতোয়াও দেয়া হচ্ছে যে, পর্দা হারাম। কিছুদিন পূর্বে

লিবিয়ায় এই ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে যে, ইসলামের পর্দা নিষ্প্রয়োজনীয়ই নয় বরং ইহা হারাম এবং এখন থেকে কোন মহিলা পর্দা করবে না। যারা করবে তারা আইন ভংগকারী বলে সাব্যস্ত হবে। বস্তুতঃ যে সমস্ত মুসলিম দেশ যাদিগকে ইসলামের হেফাযতকারী মনে করা হত স্বয়ং ঐ সমস্ত দেশগুলোতেই এই মহামারী এইরূপ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যে, ইহা কেবল কুরআন করীমের হুকুম বিরোধীই নয়, বরং ইহা এই হুকুমকে সম্পূর্ণরূপে উল্টিয়ে দিচ্ছে। একমাত্র আহমদী মুসলমান মহিলাগণই অবিশিষ্ট ছিল যাদের নিকট থেকে এই প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, তারা এই ময়দানে জেহাদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং পলায়নকারীদের কদম রুখবে বা বাজিতে জিতে দেখাবে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও দুঃখের সংগে এই কথা বলতে হয় যে, আহমদী মহিলাগণ নিজেরাও এই ময়দানে দুর্বলতা প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে বেপর্দেগীর এই মহামারী প্রসার লাভ করছে। প্রথমে বড় নগরগুলোতে ইহা শুরু হয়েছে এবং পরে ছোট ছোট শহরগুলোতে ইহা ছড়িয়ে পড়ছে। এইরূপ মনে হচ্ছে যে, আমরা যেন এই জেহাদের ময়দানে বাজিতে হেরে যাচ্ছি।

এজন্যে আমি ইহা উপলব্ধি করেছি এবং বড় জোরের সাথে আল্লাহ্‌তা'লা আমার অন্তরে এই তাহ্‌রীক করেছেন যে, আহমদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন। কেননা, যদি আপনারও এই ময়দান পরিত্যাগ করেন তাহলে দুনিয়াতে আর কোন্ মহিলা আছে যারা ইসলামী মূল্যবোধের হেফাযতের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হবে। ....

আমাদের গ্রামাঞ্চলে চাদরের পর্দা প্রচলিত আছে। এতে ঘোমটার ব্যবস্থা আছে এবং যতদূর সম্ভব ডাইনে–বামে চাদর জড়িয়ে দেহকে আবৃত করা হয়। এই জাতীয় পর্দার সাহায্যে লজ্জা–শরমের সাথে গমনকারীণি মহিলারা স্বামীদের জন্যে রুটি পৌছানোর উদ্দেশ্যে ক্ষেত–খামারে যায়। ইসলামে ইহা কোন ব্যতিক্রম নয়। বরং ইহা ইসলামী পর্দার মূল কাঠামোর একটি অংশ। কুরআন করীমে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে আঁ–হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ বিষয় সম্বন্ধে খুব পরিষ্কাররূপে বর্ণনা দিয়েছেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)–ও আয়াতের আলোকে, যা আমি শুরুতে পাঠ করেছিলাম, বলেছেন যে, একটি পর্দা হল যাতে শরীরের চিবুক পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা হয় এবং মাথাকেও সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দেয়া হয়। এমন

কোন প্রসাধন ব্যবহার করা উচিত নয় যার ফলশ্রুতিতে খামাকা মন্দ ব্যক্তিদের দৃষ্টি প্রলুব্ধ হয়। এই সমাজের যে সকল মহিলা মানমর্যাদার সাথে বিনা প্রসাধনীতে প্রয়োজনের খাতিরে বের হয়, তারা ইসলামী পর্দা পালন করে। তারা পর্দার কানুন পালন করে। ব্যতিক্রম তো উহাই যা কানুনের পরিপন্থী। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বলেন যে, ইহা ঐ পর্দা যা ইউরোপবাসীগণের জন্যে বোঝা নয় এবং উহা কঠিনও নয়। কেননা, তাদের সমাজে মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে খুব বেশী অগ্রসর হয়েছে এবং তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এজন্যে তাদিগকে বের হতে হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, যদি তথাকার মহিলারা এই জাতীয় পর্দা করে তাহলে তারা তাদের পরিবেশে ইসলামী পর্দা পালন করে। ....

বোরকার ব্যাপারে এই কথা বলা যায় যে, ইহাই নির্ধারিত ইসলামী পর্দা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি ও সময় অনুসারে ইহা খলীফাগণের কাজ এবং ইহা তাঁদের কর্তব্য যে, এই ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা সমন্বয় এন্তেযামী ফয়সালা গ্রহণ করেন। যদি কোন সোসাইটিতে বোরকা প্রচলিত থাকে এবং চাদর উহার স্থান দখল করতে থাকে তাহলে দেখতে হবে যে, এর দ্বারা ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে কিনা। যদি এর দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত না হয় তা, হলে ইহাই সিদ্ধান্ত হবে যে, চাদর গ্রহণ করাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ইহার দ্বারা কদম সুনিশ্চিত রূপে পথ ভ্রষ্টরাও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয় এবং এই বিপদ নেমে আসে যে, কেবল বোরকারই বিলুপ্ত হবে না বরং এর দরুন ধীরে ধীরে পর্দাও তিরোহিত হয়ে যাবে। এ সময়ে খলীফা যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হবেন এবং খোদার সামনে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। ....

তাক্ওয়ার সাথে কাজ করা উচিত। আপনারা আমার বিরুদ্ধে নিশ্চিতরূপে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। আমি ইহার কোনই পরওয়া করি না। কিন্তু আমাকে এই মাকামে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, আমি আপনাদের নেগরানী করি। এজন্যে আমি আপনাদের নিকট একথা সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে, কুরআন করীম (৭৫ঃ১৫-১৬) বলছে ঃ

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٦﴾

তোমরা লক্ষ বাহানা ও ওজর-আপত্তি উত্থাপন করতে পার যে, ইসলামী পর্দার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করছি এবং তোমরা এই বাহানাও করতে পার যে, চাদরই ইসলামী পর্দা। কিন্তু আমি জানি এবং আমার অন্তরও একথা জানে এবং আপনাদের অন্তরও জানে যে, ঐ চাদর যা আজকাল পর্দার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে কোন মতেই তাহা ইসলামী নয়। ....

প্রকৃত পক্ষে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভয়াবহ বিপজ্জনক যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। চুতর্দিকে নির্লজ্জতার প্রার্দুভাব হচ্ছে। চতুর্দিকে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যে, যদি আপনারা বিশেষভাবে পর্দার হেফাযত না করেন তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এতো বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হবে যে, আপনারা তখন আক্ষেপের সঙ্গে তাকিয়ে থাকবেন এবং তাদিগকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। ....

আমেরিকান সোসাইটির অবস্থাতো এই যে, তথায় আহমদী মহিলারা চাদর নয় বোরকা পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। তারা বলে যে, যদি আমরা বোরকা না পড়ি তাহলে আমরা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মূল্যবোধের হেফাযত করতে পারি না। ....

এই দেশে প্রাথমিক যুগের ঐ ইসলামী পর্দাই বলবৎ করতে হবে এবং যে সকল স্থানে সোসাইটিতে এরূপ অবস্থা বিদ্যমান নেই, তথায় পর্দার ব্যাপারে অন্য রকম হুকুম প্রযোজ্য হবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মুল মোমেনীন এবং অন্যান্য অনেক মহিলা পর্দা পালন করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। ওহুদের যুদ্ধে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন। এইরূপে অন্যান্য যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছেন এবং বড় বড় খেদমত পেশ করেছেন।

কোন কোন মহিলা বলে যে, গরম খুব বেশী। আমরা কীরূপে বোরকা পরে বাইরে যাব ? পুরুষদের কী আসে যায় ! তারা যেভাবেই চায় সে ভাবেই বাইরে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই কথা ঠিক নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে, তখনও আমাকে বাইরে যেতে হয়। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে যেখানে ক্ষুদ্র প্রাচীরের নিচু ছাদযুক্ত মসজিদ রয়েছে তথায় যখন আচকানের বোতাম উপর পর্যন্ত বন্ধ করতে হয় তখন এইরূপ মনে হয় যে, গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অভ্যেস না থাকা সত্ত্বেও এরূপ

করতে বাধ্য হই। সুতরাং এমন তো নয় যে, পুরুষের কখনও কষ্টের মোকাবেলা করতে হয় না। তারাও এ জাতীয় কষ্টের মধ্যে পতিত হয়।

অতএব, আমি আপনাদেরকে যা কিছু বলছি উহাতো কিছুই নয়। এখনও তো আপনাদেরকে ইসলামের জন্যে বড় বড় কুরবানী দিতে হবে। আমি দেখছি যে, ইসলাম ও আহমদীয়তের কাফেলার গতি দ্রুত হতে দ্রততর হতে যাচ্ছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে কাজের অগণিত বোঝা আপনাদের উপর ন্যস্ত করা হবে। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়লে কীভাবে আপনারা মহান খেদমতের তৌফীক লাভ করবেন ? অতএব দোয়া করুন এবং ইস্তেগফারের সাথে কাজ করুন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদিগকে তৌফীক দিন যেন ইসলামের খাতিরে প্রতিটি–কুরবানীর জন্যে আপনারা সম্মুখে অগ্রসর হন এবং আপনারা কখনো ভুলে যাবেন না যে, বাহ্যতঃ যে ময়দানে আমরা পরাজয় বরণ করছি ঐ ময়দানে নিশ্চয়ই আমাদিগকে জয়লাভ করতে হবে। ইনশাআল্লাহতা'লা।

ঐ মেয়ে যে বলেছিল যে, ইহা চলবে না, তাকে আমি বলে দিচ্ছি যে, ইহা চলবেই। ইহা খোদার কথা এবং নিশ্চয় চলবে ! তুমি যদি সঙ্গে না চল তাহলে পৃথক হয়ে যাও। ইসলামের কাফেলায় এইরূপ ব্যক্তিদের থাকার কোন অধিকার নেই। কিন্তু ইসলামের কাফেলা নিশ্চয় চলবে এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ও কুরআনের কথা নিশ্চয় চলবে এবং সদা চলতে থাকবে, এমনকি যদি আমার শেষ রক্ত-বিন্দুও এই জন্যে প্রবাহিত করতে হয়।" (আল্‌ ফযল, ২৮/২/৮৩)

পরিশিষ্ট - ২

পর্দা সম্বন্ধে হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাগিদপূর্ণ নসীহত ঃ

"যখন হতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে কোন কোন আহমদীর মধ্যে পর্দা উঠে গেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ত্রুটি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে দেয়া যায়। আমি অবাক হই যে, এ সকল নির্লজ্জ এবং কাপুরুষ ব্যক্তিরা যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কথা মানে না তারা

নিজেদের জাতির কী খেদমত করবে ? জাতির খেদমত করার লোক তো তারা ছিলেন যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের এতায়াতের এরূপ উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন যে, আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাদের ঘটনাবলী পাঠ করে মানুষের হৃদয় ভালবাসার আবেগে ভরপুর হয়ে যায়।

অতএব, আমি এই খোৎবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদিগকে যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদিগকে তাগিদ দিচ্ছি এবং তাদিগকে স্বীয় সংশোধনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ....

মিশ্র মজলিসে (Mixed Party) মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সংগে হেসে হেসে কথা বলা .... এই সমস্তই নাজায়েয কাজ। প্রয়োজনের সময় শরীয়ত তাদিগকে কোন কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে ....। কোন জটিলতাই এমন নয় যে, উহার প্রতিকার শরীয়তে রাখা হয়নি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে, খোদাতা'লা মানুষের সুবিধার জন্যে সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ এই যে, সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সংগে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? আমাদের জামাতের মহিলা ও পুরুষদের জন্যে ইহা ফরয যে, তারা যেন এইরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সংগে কোন সম্পর্ক না রাখেন।"

[৬ই জুন, ১৯৫৮ই তারিখের জুমুআর খোৎবা ; আল্ ফযল ২৭শে জুন, ১৯৫৮ইং থেকে উদ্ধৃত]

['আহমদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন' পুস্তিকা থেকে]